বিশ্ব ঐক্য বনাম.....

আজিজুস সামাদ আজাদ

১৯১৪ সাল। সে সময়ে পৃথিবীর স্বীকৃত পরাশক্তি ছিল ছয়টি, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী, তুরষ্ক বা অটোমান সাম্রাজ্য। ঠিক ঐ সময়েই ছয়জন আততায়ীর গুলিতে অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার গ্রান্ড ফার্দিনান্দ তার স্ত্রী সহ মারা গেলেন তারই সাম্রাজ্যের একটি অংশে, বসনিয়া-হার্জিগোভিনায়। আততায়ীরা ছিল স্বাধীনতাকামী গ্রুপের অংশ, যারা অষ্ট্রো হাঙ্গেরীর দক্ষিন পূর্বাংশ নিয়ে যুগস্লাভিয়া নামক রাষ্ট্র গড়তে চাইছিল। এই হত্যাকান্ড তৎকালীন সুপার পাওয়ার অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর খুব গায়ে লেগেছিল। তাদের সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারকে মেরে ফেলেছে তাদেরই সাম্রাজ্যের বাসিন্দারা, কিছু একটা না করলে মান সন্মান থাকে না। বাঘের যেমন ভেড়া খেতে যুক্তির কোন অভাব থাকে না তেমনি তাদেরও যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে সময় লাগলো না। তারা জানিয়ে দিল, এই হত্যাকান্ডের পেছনে রাশিয়ার হাত আছে, সুতরাং, রাশিয়ার সাথে আমরা যুদ্ধ ঘোষনা করলাম।

রাশিয়াকে কেন বেছে নেয়া হল? ঐ সময়টা ছিল কলোনিয়াল যুগের ক্রান্তিকাল। রাশিয়া কলোনি তৈরী করার চেয়ে নিজের ঘর সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছিল। তার উপর মাত্র দেড় দশক আগেই অচেনা অজানা এক পুঁচকে দেশ জাপানের হাতে চুড়ান্ত মার খেয়ে সর্বশান্ত। সেই কারনেই হয়তো রাশিয়াকে বেছে নেয়া। সমস্যা একটা ছিল। কারণ, রাশিয়ার সাথে সামরিক চুক্তি ছিল বৃটেন ও ফ্রান্সের, সুতরাং, সাথে সাথে রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নেমে পড়লো তারা। এদিকে জার্মানী পক্ষ নিল অষ্ট্রো হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের। আরেক সুপার পাওয়ার, তুরষ্কের অবস্থা তখন রাশিয়ার চেয়ে কোন অংশে ভাল নয়। যদিও তাদের মৌন সমর্থন ছিল অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যের প্রতি কিন্তু তারা ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কোন পক্ষই নিল না। বৃটেন চাইছিল বিশ্ব শক্তি হিসেবে তুরষ্কের, অর্থাৎ, অটোমান সাম্রাজ্যের পতন। তারা রাশিয়াকে উষ্কানী দিল বসফরাস প্রনালীতে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাতে। ব্যাস, তৎকালীন বিশ্বের স্বীকৃত সব সুপার পাওয়ারই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। কিন্তু এর মাত্র এক বছর পরেই,

১৯১৭ সালে, যাকে নিয়ে যুদ্ধ সেই রাশিয়াই যুদ্ধ করবে না বলে জানিয়ে দিল।

আর একটু পেছনে না গেলে যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা হারিয়ে ফেলবো। কারণ, নায়কই বলি আর খলনায়কই বলি, বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র একচ্ছত্র মহাপরাক্রমশালী রাষ্ট্র, "যুক্তরাষ্ট্র"। ঐ সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে অনুসরণ না করলে বর্তমানে তারা যে কথায় কথায় যে কোন দেশের প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ, যুদ্ধের হুমকী দিয়ে যাচ্ছে, সেটার কারণ খুঁজে পাবোনা। এই তো সেদিন তারা চারটি জাহাজে বিস্ফোরনের জন্য কিংবা সৌদি আরবের ভেতরে তেল সরবরাহ লাইনে বিস্ফোরনে ইরানকে দায়ী করে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়া শুরু করার কথা ভাবলো। কিংবা আরো আগে, ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রেরই নেতৃত্বে ছয় জাতির পারমানবিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে জানালো, আমি যদিও এই চুক্তি মানি না কিন্তু ইরানকে চুক্তির শর্ত মানতে হবে, নইলে যুদ্ধ। ঐ নেকড়ে আর মেশ শাবকের গল্প।

নাহ, আরও পিছিয়ে যাই, বেশী ভাবনা চিন্তা না করে একেবারে যুক্তরাষ্ট্রের শুরুতেই চলে যাই। ১৪৯২ সাল, কলম্বাস সাহেব ভারত মনে করে নতুন পৃথিবী যুক্তরাষ্ট্রে পা ফেললেন। স্বাভাবিক ভাবেই এটা যে ভারত নয়, নতুন একটি স্বয়ং সম্পুর্ন পৃথিবী সেটা বুঝতে বুঝতেই এবং ভাগ্যান্বেশনে নতুন পৃথিবীতে ইউরোপীয়ান মানুষের ঢল নামা শুরু হতে হতে প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গেল। নতুন পৃথিবীতে পা ফেলেই তারা মেরে সাফ করা শুরু করলো স্থানীয়দের, যাদের তারা নাম দিয়েছিল রেড ইন্ডিয়ান। আর্জেন্টিনার মত কিছু দেশে তো স্থানীয়দের পুরোই সাফ করে দিল। যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা উদার হওয়ায় পুরো সাফ না ক'রে কিছু রেখে দিল প্রাথমিক ভাবে যুদ্ধবন্দী হিসেবে, বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। পরে অবশ্য এই বন্দীশালার নাম পরিবর্তন করে নাম দেয়া হয়েছে "রেড ইন্ডিয়ান রিজার্ভেশন" এবং কিছু অধিকার দিয়ে নিজ ভূমে পরবাসী করে রাখা হয়েছে।

ইউরোপীয়ানদের এই ধরনের কর্মকান্ডের ইতিহাস আরও বহু যায়গাতেই আছে, আর এই কারনেই "আদীবাসী' থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন নাম দিয়ে

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অন্যান্য জাতির মাঝেও একই ধরনের নিষ্ঠুরতা খুঁজে বেড়ায় কিন্তু পায়না। মানবতার বিরুদ্ধে ইউরোপীয়ানদের যুগান্তকারী আক্রমন বলতে হয়তো রেড ইন্ডিয়ান হত্যাকান্ডকে স্থান দেয়া যেতে পারে। তবে ইউরোপীয়ানদের এই ধরনের বিভিন্ন যুদ্ধ শেষে সাধারন মানুষের রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেবার ইতিহাস বহু রয়েছে এবং এসব ইতিহাসের সাথে তুলনা করা চলে শুধু হিরোশিমা আর নাগাসাকির ওপর অপ্রয়োজনীয় পারমানবিক বোমা ব্যবহারের সাথেই।

এই লেখার মূল উদ্দ্যেশ্য দুইটি,
১) স্যামুয়েল পি হান্টিংটন লিখিত গ্রন্থ "দা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশ্যন"। সেখানে তিনি বহু উদাহরণ টেনে প্রথমে বোঝাতে চেয়েছেন, পৃথিবীর তাবৎ সংঘাতের মূলে রয়েছে সভ্যতার সাথে সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে সংঘটিত যুদ্ধ সমুহ। বইটির পরের অংশে তিনি পৃথিবীর শেষ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী করে প্রমান করার চেষ্টা করেছেন, পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ হবে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামী সভ্যতার যুদ্ধ। উনি বিশাল চিন্তাবিদ, ওনার কথার প্রতিবাদ না করে আমার জানার খুব আগ্রহের কথাটুকু শুধু বলতে চাই, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধকে উনি কোন সভ্যতার সাথে কোন সভ্যতার যুদ্ধ হিসেবে দেখছেন কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে অথবা নেপোলিয়ানের যুদ্ধকে উনি কোন সভ্যতার কোন সভ্যতার যুদ্ধ হিসেবে দেখছেন। তাছড়া ইসলাম একটি ধর্ম, তার সাথে পশ্চিমা বিশ্বের যুদ্ধ কোন কারণে দুই সভ্যতার যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হ'লে, পশ্চিমা সভ্যতা বলতে উনি কি বুঝিয়েছেন সেটা বোধগম্য নয় অন্তত আমার কাছে।

২) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, বর্তমান বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর অবস্থান বিশ্লেষন করা। সেটা করার আগে যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসকে দেখে আসার চেষ্টা করছি। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র-চৈনিক বানিজ্য যুদ্ধ যেদিকে রওনা হয়েছে এবং ইরান ইস্যুকে যে ভাবে ব্যবহার অথবা ইরানের সাথে যে আচরণ করছে, সেটাতে একটি ধারনা জন্মায় যে, আগামী বছর তিনেকের এর মাঝে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে দুটো বিকল্প খোলা থাকবে,

ক) বিশ্বের নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া।
খ) পারমানবিক অস্ত্র প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়ে মানব সভ্যতার শেষ প্রান্তে পৌঁছানো।

তবে আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত প্রথম বিকল্পই বেছে নেবে কিন্তু তার আগে কিছু ক্ষ্যাপাটে আচরন করে নিজের জন্য সর্বোচ্চ ফায়দা নেয়ার অবস্থান সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্র শেষ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা বিহীন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিল। আমরা আরেকবার একটু ইতিহাস চর্চা করে আসি।

যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র ১৭৭৬ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কার্যক্রম শুরু করার ক্ষমতা পাবার আগে পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ছিল ইউরোপীয় শক্তি সমুহের দখলদারী ও শক্তি প্রদর্শনের যুদ্ধ ক্ষেত্র। মূল খেলোয়ার ছিল যুক্তরাজ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ফ্রান্স, স্পেন ও ডাচ। তবে ১৭৬৩ সালে সাত বছর ব্যাপী বৃটেন-ফ্রান্স যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হবার পর তারা নতুন বিশ্বের এই ঔপনিবেশিক খেলা থেকে ছিটকে পরে, এমনকি কানাডাকেও তুলে দিতে হয় বৃটেনের হাতে।

যাক, যুক্তরাষ্ট্র বেশ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পেল যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে এবং খুব অল্প সময়ের মাঝেই যুক্তরাজ্য তার ইউরোপিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীদের এই অঞ্চল থেকে সরাবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভাল বন্ধু হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২৩ সালে মনরো'জ ডক্ট্রিন নামে যুক্তরাষ্ট্র একটি আদেশ জারি করলো, যেটাতে ইউরোপীয় দেশ সমুহকে নতুন বিশ্বে নতুন করে ঔপনিবেশিক কার্যক্রমে নিষিদ্ধ করা হল।

নাহ, তখনও যুক্তরাষ্ট্রের নাম পৃথিবীর ক্ষমতাধর রাষ্ট্র গুলোর মধ্যে একটি হিসেবে উচ্চারিত হতো না। কিন্তু মূলত যুক্তরাজ্যের সম্পুর্ন সমর্থনে তারা এই কাজটি করার উদ্যোগ নিয়েছিল। এমনকি প্রাথমিক ভাবে তো এই সিদ্ধান্তও ছিল যে, তারা উভয়ে জয়েন্ট ডিক্লারেশন হিসেবে মনরো'জ ডক্ট্রিন ঘোষনা

করবে। বিবিধ কারণে আরও অনেক ঘটনাই ঘটে চলেছিল নতুন বিশ্বে, আমরা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশক্তি হিসেবে উত্থানের কিছু অংশ ছুঁয়ে যাবো।

এবার চলে যাই ১৮৯৮ সালে। কিউবা তখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে স্পেনের সাথে। ঠিক সেই সময় কিউবা প্রণালীতে অবস্থানরত যুক্তরাষ্ট্রের একটি জাহাজে বিস্ফোরন ঘটলো। ব্যাস, সাথে সাথেই এই বিস্ফোরনের পেছনে স্পেনের যোগসূত্র পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষনা করলো স্পেনের বিরুদ্ধে (কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া চারটি জাহাজে বিষ্ফোরনের সাথে ইরানের কালো হাত খুঁজে পাবার বেশ মিল আছে)এবং স্পেন সেই যুদ্ধে হেরে গিয়ে শুধু কিউবা বা পুরো আমেরিকা নয়, প্রায় পুরো পৃথিবীর বুকে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে বিদায় নিল।

স্পেনের এই পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে স্পেনের আরেক উপনিবেশ ফিলিপাইনও চলে এলো যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে। কিন্ত তার আগেই ফিলিপাইনের জনগন স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিল স্পেনের বিরুদ্ধে, এখন সেই সংগ্রাম শুরু হল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী ভাবে জয় পেল যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র এখন তার নতুন বিশ্ব ছাড়াও পুরনো বিশ্বের শক্তি মঞ্চে আবির্ভুত হল। তবে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে স্বীকৃত বিশ্বশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাবের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পার্ল হারবার আক্রমনের পর যেমন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে জড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ঠিক তেমনি ১৯১৭ সালে জার্মান সাবমেরীন বা ইউবোট যখন যুক্তরাষ্ট্রের বানিজ্য জাহাজ মাঝ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিল, সাথে সাথেই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষনা করলো জার্মানীর বিরুদ্ধে। শুরু হল যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশক্তি হিসেবে তার ক্ষমতা দেখাবার পালা। যুক্তরাষ্ট্র এখন থেকে স্বীকৃতি পেল বিশ্ব পরাশক্তির একটি হিসেবে। যদিও পার্ল হারবার এবং এই ইউবোট কাহিনীর বিষয়ে অনেক ষড়যন্ত্র তত্ব আছে কিন্ত আমরা ঐ পথে যাবো না।

এরপরের গল্প গুলো আরও ঘটনা বহুল। আমরা একধাপ এগিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে চলে যাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবী পুনর্গঠনে "মার্শাল প্ল্যান" এর মাধ্যমে বিশাল সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিল মূলত ইউরোপের দিকে। তার সাথে কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে শীতল যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দেয়া শুরু করলো। "মার্শাল প্ল্যান" যতটুকু না মানবিক ছিল, তারচেয়ে বেশী ছিল ব্যবসায়ীক। আমরা ঐদিকেও যাবোনা।

আমরা চলে যাবো ১৯৪৬ সালে, "ব্রেটন উড" এগ্রিমেন্টের কাছে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্-বানিজ্যের সুবিধার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ডলারকে বিশ্বের অর্থনৈতিক বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মেনে নিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই একমত হল। যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল স্বর্ণের রিজার্ভ এক্ষেত্রে মৌলিক উপাদান হিসেবে গৃহিত হল। বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্র যদি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ডলার ফেরত পাঠায় তবে প্রায় ৩৫ ডলার প্রতি আউন্সে দেবার বিষয় নিশ্চিত করলো যুক্তরাষ্ট্র। এখন শুধু শক্তির দিক থেকে বিশ্বশক্তি নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও অদ্বিতীয় বিশ্বশক্তি হয়ে গেল যুক্তরাষ্ট্র।

কিন্ত বেশী ভাত যেমন দুধ দিয়ে মাখিয়ে খাওয়া যায় না তেমনি যুক্তরাষ্ট্রও বেশীদিন এত ক্ষমতা ধরে রাখতে পারলো না। বেশ কিছু রাষ্ট্র ইচ্ছাকৃত ভাবে ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ শুরু করলো। স্বর্ণের রিজার্ভ কমা শুরু হল যুক্তরাষ্ট্রের। তার সাথে যুক্ত হল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিপুল খরচ মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র যথেচ্ছ হারে ডলার ছাপাতে লাগলো। যুক্তরাষ্ট্রের ডলার তার বিশ্বাস যোগ্যতা হারাতে শুরু করলো। এসে গেল ১৯৭১ সাল। যুক্তরাষ্ট্র ঘোষনা করলো, এখন থেকে তোমার ডলার তোমার আমার স্বর্ণ আমার। আমি আর তোমাদের ডলারের বিনিময়ে স্বর্ণ দেবো না। বিশ্ব অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সম্ভবনার দুয়ার খুলে গেল।

নাহ, বেশীদিন নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উদ্ভাবনী শক্তিকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। ১৯৭৪ সালে তারা সৌদি আরবের সাথে অদ্ভুত এক চুক্তি করলো। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এখন থেকে সৌদি আরব বিশ্বের কাছে শুধু

ডলারে তাদের তেল বিক্রি করবে। ওপেকের মাধ্যমে সৌদি সরকার অন্যান্য প্রায় সব আরব দেশ গুলোকেও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একই চুক্তিতে রাজি করিয়ে ফেললো।

জ্বালানী তেল সব দেশেরই প্রয়োজন এবং মধ্যপ্রাচ্য আর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের জ্বালানী তেলের সর্বোচ্চ ভান্ডার নিয়ে বসে আছে এবং ডলার ছাড়া কোন দেশ সেটা কিনতে পারবে না। ব্যাস, সব দেশেরই প্রয়োজন দেখা দিল তখন ডলারের। স্বর্ণ তার যায়গা ছেড়ে দিল খনিজ জ্বালানি তেল নামক তরল স্বর্ণের কাছে। শুরু হল নতুন যুগ, পেট্রো ডলারের যুগ।

কেন মধ্যপ্রাচ্য এরকম একটি চুক্তিতে রাজি হল?

পশ্চীমা বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকারী চিন্তাবিদ হান্টিংটন সাহেবেরা যখন ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে, পৃথিবীর সর্বশেষ যুদ্ধ হবে পশ্চীমা সভ্যতা এবং ইসলামের মাঝে তখন পশ্চীমা বিশ্বের থিংক ট্যাংকের মানসিকতা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং, বর্তমান বৈশ্বিক দ্বন্দ্বের পরিনতি ভাবতে হলে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা না করলেই না।

ইসলাম প্রচার শুরুর আগেই পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য পশ্চীমে তার শক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে। কিন্তু পূর্ব দিকে ইস্তাম্বুল কেন্দ্রীক রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ইসলাম প্রচার শুরুর আগেই বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নাম নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত। ইরান কেন্দ্রীক আরেকটি বড় এবং প্রাগৈতিহাসিক্য পারসিক সাম্রাজ্য পাশাপাশি অবস্থান করবার কারণে এই দুই সাম্রাজ্যের মাঝে রেশারেশির কোন অভাব ছিল না। পারসিক সভ্যতাকে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো এবং শক্তিশালী সভ্যতা বলে স্বীকার করা হয়। অনেক ইতিহাসবেত্তা তো মনে করেন, পারসিক সভ্যতা আট/নয় হাজার বছরের পুরোনো এবং অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পারসিক সম্রাজ্যের চুড়ান্ত সময়ে পৃথিবীর প্রায় ৫০% মানুষ এই সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। ইসলাম প্রচার শুরু হবার প্রথম ধাক্কাতেই দুটি শক্তিরই পতন ঘটে। কিন্তু বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামকা ওয়াস্তে হলেও আরও কিছু দিন টিকে ছিল।

ততদিনে মুসলিম বিশ্বে অটোমান নামে তুরষ্ক কেন্দ্রীক আরেকটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। ইসলামের খিলাফত মক্কা-মদিনা-দামেস্ক-বাগদাদ ঘুরে ত্রয়োদশ শতকে বেশ দুর্বল হয়ে পরে। যে কারনে, তুরষ্কের মুসলিম অটোমান সাম্রাজ্য চতুর্দশ শতকে এসে বিদ্রোহী খেলাফত দাবী করে বসে এবং ষোড়শ শতকে মক্কা-মদিনা, সিরিয়া, মিশর সহ আফ্রিকা-পূর্ব ইউরোপ-এশিয়া সহ প্রায় সম্পুর্ন ইসলামী বিশ্বের নিয়ন্ত্রন নেবার পর তাদের খিলাফত পরিপুর্ণতা পায়। এদিকে প্রায় একই সময়ে অটোমানদের পাশেই রাশিয়া নামের আরেকটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। এই দুই সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্ব প্রথম থেকেই বিদ্বমান ছিল।

অষ্টাদশ শতকে বিশ্ব শক্তি মঞ্চে আরেকটি বড় শক্তি বৃটেন আবির্ভুত হয় এবং অটোমান সম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হামলা চালাতে থাকে। উনিশ শতকের শেষে এসে তারা অটোমান সাম্রাজ্যের কাছ থেকে মিশর ছিনিয়ে নেয় এবং মিশরের রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তি সময়ে ইসলামী বিশ্বের অবস্থান

আগেই বলেছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে শুরু হলেও তুরস্ক নিজের দূর্বল সামরিক শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকায় এই যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষ নিয়ে নেমেছিল ১৯১৬ সালে রাশিয়ার ইন্ধনে। কিন্তু তার আগেই আরও কিছু ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। তুরস্কের খলিফা ঐ সময় মক্কা মদিনা নিয়ন্ত্রন করতো এবং শরিফ আল হোসেন ছিল তুরষ্কের প্রতিনিধি বা গভর্নর, সরাসরি তুরস্কের নিয়ন্ত্রনে। মদিনাতে তুরষ্কের বাহিনী থাকলেও মক্কায় অটোমান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রনেই একটি আরব বাহিনী নিয়োজিত ছিল। একই সময়ে বর্তমান সৌদি আরবের একটি অংশ নেজাদের (রিয়াদ ছিল রাজধানী) শাসক ছিলেন আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯১৬ সালে, মধ্যপ্রাচ্যের স্বালানী নিয়ন্ত্রনে নেয়ার জন্যই হোক অথবা তুরষ্কের খিলাফত ধ্বংস করার জন্যই হোক,

যুক্তরাজ্য প্রথমে শরিফ আল হোসেনের কাছে হাজির হয়ে প্রস্তাব দিল, যদি তুমি এই যুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের খলিফার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষনা কর তবে তোমাকে আমরা অত্র অঞ্চলের বাদশাহ হিসেবে স্বীকার করে তো নেবোই, সাথে জ্বালানী সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য এবং রাজ্য চালাবার জন্য তোমাকে বিপুল পরিমান (জনশ্রুতি আছে, সাত মিলিয়ন) পাউন্ড দেওয়া হবে। শরীফ আল হোসেন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না এবং দুর্বল অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে স্বাধীনতা ঘোষনা করে বৃটিশ পক্ষ নিলেন।

একই সময়ে বৃটিশরা আরেকটি চুক্তি সাক্ষর করলো নেজাদের শাসক আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদের সাথে। শর্ত খুব সহজ, প্রায় একই কিন্তু মক্কা-মদিনা আব্দুল আজিজের নিয়ন্ত্রনে না থাকায় তার ভাগ্যে অতবড় টাকা জুটলো না। ব্রিটিশরা তাকে মাসে পাঁচ হাজার পাউন্ড দিয়েই খুশী করে ফেললো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ ভাগে এসে পরাজিত অটোমান সাম্রাজ্য তার নিজের বর্তমান যায়গাটুকু ছাড়া, জেরুজালেম সহ সব এলাকা তুলে দিল অন্যান্য বিশ্ব শক্তির হাতে। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে ভার্সাই চুক্তিতে তুরষ্ক স্বাক্ষর করলো। কামাল আতাতুর্ক তখন তুরষ্কের আবিসাংবাদিত নেতা হওয়া সত্ত্বেও খলিফা পদটি রাষ্ট্রের অলঙ্কার হিসেবে রেখে দিলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে পশ্চীমা বিশ্বের চাপ সহ্য করতে না পেরে খলিফা পদটি তিনি বিলুপ্ত ঘোষনা করলেন।

এবার শুরু হল আরেক খেলা। যেহেতু শরীফ আল হোসেন মক্কা-মদিনার বাদশাহ এবং যেহেতু তুরষ্ক খলিফা পদটির দাবী ছেড়ে দিয়েছে এবং যেহেতু তার সাথে বৃটিশদের বন্ধুত্বের চুক্তি আছে, সুতরাং, স্বাভাবিক ভাবেই মক্কা-মদিনার বাদশাহ হিসেবে সে ১৯২৪ সালের মার্চে নিজেকে ইসলামী বিশ্বের খলিফা দাবী করে বসলো। আবার খলিফা!! বৃটিশরা বাদশাহ মানতে পারে কিন্তু মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক খলিফা শব্দটি মেনে নিতে রাজী হবে না এটা বুঝতে হয়তো শরীফ সাহেবের অসুবিধা হয়েছিল। সুতরাং, যা ঘটবার তাই ঘটলো। বৃটিশরা নেজাদের শাসক আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদের পক্ষ নিয়ে শরিফকে আক্রমন করবার জন্য বললো এবং একই বছরের সেপ্টেম্বরে শরীফ আল হোসেনকে পরাজিত করে বর্তমান "সৌদি আরব" এর ম্যাপ তৈরী

ক'রে বাদশাহ পদবী নিয়ে আব্দুল আজিজ ইবনে সৌদ আবির্ভুত হলেন মধ্য প্রাচ্যের জ্বালানী তেল নিয়ন্ত্রনের রাজনীতিতে, পশ্চীমা বিশ্বের বন্ধু হিসেবে।

ইতিহাস আমাদের আলোচনার মূল বিষয় বস্তু নয়। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আরও অনেক ঘটনা রয়ে গিয়েছে। আমরা বরং চলে যাই ১৯৭৪ সালের পেট্রোডলারের উত্থান অংশে। পেট্রো-ডলার চুক্তির পর থেকে জ্বালানী তেল কেনার একমাত্র মাধ্যম ডলারের চাহিদা পৃথিবী জুড়ে বাড়তে লাগলো। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ১৯৮১ সালের মাঝেই মার্কিন ডলার বিশ্ব-বানিজ্যে একছত্র অধিপতি হয়ে বসলো। এর মাঝে আরো দু'য়েকটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই না। তৎকালীন বিশ্বের আরেক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পতনের আগে ১৯৭৯ সালে কি মনে করে আফগানিস্তান দখল করে বসলো।

যুক্তরাষ্ট্র হয়তো এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। পাকিস্তানকে বৃটিশ পদ্ধতিতেই টাকার বিনিময়ে বন্ধু বানিয়ে আলকায়েদা-তালিবান নামের সংগঠন গড়ে তুললো সোভিয়েত বাহিনীকে পরাজিত করবার জন্য। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত পরাজিত হয়ে আফগানিস্তান থেকে বিদায় নিল। এলো ১৯৯১ সাল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবার মধ্য দিয়ে বিশ্বশক্তি মঞ্চের খেলা থেকে তাদের করুন বিদায় ঘন্টা বেজে উঠবার সাথে সাথেই আলকায়েদাই বলি আর তালেবানই বলি, পশ্চীমা বিশ্বের কাছে তারা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পরলো। আর যুক্তরাষ্ট্র হ'য়ে উঠলো বিশ্বের প্রধান পরাশক্তি। ন্যাটোকে সাথে নিয়ে আল-কায়েদা-তালেবানদের সরিয়ে দেবার জন্য আফগানিস্তান আক্রমন করলো, অজুহাত যেটাই হোক না কেন।

আমরা সিরিয়ার পথে রওনা হব কিন্তু তার আগে ইরান ও ইরাককে আর একটু না দেখে গেলে বর্তমান ঘটনাবলীকে মেলানো কঠিন হয়ে পরবে।

ইরান ও ইরাকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলাম প্রচারের প্রথম ধাক্কাতেই ইরান কেন্দ্রীক পারসিক সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও ইসলাম ধর্ম এখানে পুর্ণতা পায় অষ্টম/নবম শতকে এবং ষোড়শ

শতকের শুরুতেই ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, ইরান কর্তৃক শিয়াকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষনা ক'রে বিরাট এলাকা জুড়ে তারা তাদের নিজস্ব সাম্রাজ্য গঠন করলো। এলাকার বিরাটত্ব বোঝার জন্য বলতে হয়, অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বর্তমানের ইরান ছাড়াও এই সাম্রাজ্যের দখলে ছিল বর্তমানের আজারবাইজান, বাহরাইন, ইরাক, আর্মেনিয়া, পূর্ব জর্জিয়া, ককেশাসের একটি বিশাল অঞ্চল এবং কুয়েত, আফগানিস্তান, ভারত উপমহাদেশ, সিরিয়া, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান এমনকি বর্তমান তুরস্কেরও কিছু অংশ।

স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন ইরান তার পার্শ্ববর্তি দুই বিশাল সাম্রাজ্য, রাশিয়ান ও অটোমান সাম্রাজ্যের সাথে বহু ঘাত প্রতিঘাত ও পরাজয়ে ক্লান্ত। বিংশ শতকে প্রবেশ করেই ক্লান্ত ইরান আবার কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে আক্রান্ত হয়। এই সময়ে ইরানে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সূচনা এবং তাদের দেশে জ্বালানী তেলের আবিষ্কার অন্যতম ঘটনা। ইরানে তেল আবিষ্কারের কারনে তৎকালীন আরেক পরাশক্তি বৃটেনও ইরানকে কব্জা করার বৃথা চেষ্টা চালায়। এর কয়েক বছর পরেই এলো প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। ইরান কোন পক্ষ না নেবার পরও রাশিয়া, অটোমান, বৃটিশরা কোন না কোন সময়ে ইরানে পা ফেলে এবং যুদ্ধ শেষে ইরানের নতুন ম্যাপ তৈরী করতে বাধ্য করা হয় ১৯২০ সালে, জন্ম নেয় ইরাক।

এবার আবার বেশ কিছুটা এগিয়ে ১৯৯১ সালের প্রথম গালফ যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে চলে যাই। ৯১'এর আগে পর্যন্ত পশ্চীমা বিশ্বের প্রিয়পাত্র ছিলেন সাদ্দাম হোসেন। ইরাক-ইরান যুদ্ধে সাদ্দাম পশ্চীমা বিশ্বের পুর্নাঙ্গ সহযোগীতা পেয়েও ইরানকে ধ্বংস করতে না পারায় হয়তো তারা সাদ্দামের উপর কিছুটা ক্ষুব্ধ ছিল। তাছাড়া যুদ্ধে কুয়েতের কাছ থেকে প্রচুর ঋন করেছিল সাদ্দাম। ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই কোন এক অদৃশ্য ঈশারায় কুয়েত সেই ঋন শোধ করার জন্য ইরাকের উপর চাপ সৃষ্টি করলো, যেটা যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত ইরাকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তার সাথে যুক্ত হল ইরাক-কুয়েত সীমান্তে অবস্থিত একটি তেলক্ষেত্র নিয়ে দুই দেশের দ্বন্দ্ব। সাদ্দাম তেল ক্ষেত্রের মালিকানা দাবী ক'রে কুয়েত দখলে পশ্চীমা বিশ্বের সবুজ

সংকেত চাইলো। পশ্চীমা বিশ্বের নিরবতাকে সাদ্দাম তাদের সবুজ সংকেত ধরে নিয়ে কুয়েত দখল করে বসলো।

ব্যাস, কুয়েতকে স্বাধীন করার জন্য সমগ্র পশ্চীমা বিশ্ব থেকে শুরু করে আরব বিশ্ব এক হয়ে গেল। লেজ গুটিয়ে সাদ্দাম কুয়েত থেকে বিদায় নিলেও রেহাই পেলো না। ন্যাটোর নেতৃত্বে গড়া পশ্চীমা শক্তি ইরাকের মাঝ বরাবর পর্যন্ত ঢুকে, সেই বরাবর একটি "নো ফ্লাই জোন"" বানিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলো, যদি শিয়া-সুন্নির সংঘাতে সাদ্দাম বিদায় নেয় তবেই কেল্লা ফতে, তাদের আর অজুহাত খুঁজতে হয় না পরদেশ দখলের। কিন্তু পশ্চীমা বিশ্ব যেভাবে আশা করেছিল সে ভাবে বিদ্রোহ হলো না, সাদ্দাম টিকে রইলো।

২০০০ সালে সাদ্দাম আরেকটি ভুল চাল দিয়ে বসলো। ঘোষনা করলো, সে আর ডলারে তেল বিক্রী করবে না। এখন থেকে সে ইউরোতে তার তেল বিক্রী করবে। এই বিষয়ে ইরাক প্রায় সর্ব সম্মতিক্রমে জাতিসংঘেরও অনুমতি পেল। পেট্রো ডলারের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার মত ধৃষ্টতা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের পছন্দ হল না। তারা সুযোগের সন্ধানে রইলো।

কিছু দিনের মাঝেই পশ্চিমা বিশ্বের গণমাধ্যম প্রচারনা শুরু করলো যে, তাদের কাছে নিশ্চিত গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে, ইরাকের কাছে এটম বোমা সহ আরও অনেক ভয়াবহ অস্ত্র আছে যা বিশ্ব মানবতার জন্য হুমকী স্বরূপ। সুতরাং, প্রয়োজন দ্বিতীয় গালফ যুদ্ধ, প্রয়োজন সাদ্দামের অপসারণ। সাদ্দাম অপসারিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে পশ্চীমা বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বের মূল্য পরিশোধ করলো। পশ্চিমা বিশ্ব অবশ্য যুদ্ধ শেষে তন্নতন্ন করে খুঁজেও সাদ্দামের সেই পারমানবিক বোমা বা মারনাস্ত্র কিছুই না পেয়ে স্বীকার করলো, তাদের গোয়েন্দা রিপোর্ট ভুল ছিল। অবশ্য এই সামান্য ভুলে লক্ষ মানুষের প্রান যাওয়া বা একটি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সব ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোন বিষয়ই নয়।

যত ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করলাম তার সব কটিতেই ঐ সময়ের ইসলামী সাম্রাজ্য গুলো, অর্থাৎ, অটোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে পশ্চীমা বিশ্বের

যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব সমুহ যাই বলিনা কেন, আরব বাহিনী শুধু নয় অন্যান্য মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্র গুলোর সেনা অথবা সেনাবাহিনীর প্রায় সবাই পশ্চীমা বিশ্বের পক্ষেই যুদ্ধ করেছে। তাহলে বলতে হয়, হান্টিংটন সাহেব তার লিখিত গ্রন্থ "দা ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন" এর সেই অমর বানী, "শেষ যুদ্ধ হবে ইসলামের সাথে পশ্চীমের" সেটার মর্মবাণী বুঝতে ইসলামী বিশ্বের অসুবিধা হয়েছে অথবা হান্টিংটন সাহেব ভুল করেছেন।

যাইহোক, সাদ্দামের পতনের পরও পেট্রো ডলারের কাহিনী না বোঝার মত কিছু দুষ্ট বালক রয়ে গেল আরব বিশ্বে। কারণ, গাদ্দাফী সব সময়ই একটু ত্যাড়া। সে স্বর্ণের বিনিময়ে তেল বিক্রী করার ঘোষনা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সাথে ওপেককেও অহবান করলো তার সাথে যোগ দিতে। আসাদ তো আরো ভীষন দুষ্ট, সে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চীমাবিশ্বের শত্রু ভাবাপন্ন শক্তি রাশিয়াকে একমাত্র ঘাঁটিটি গাড়ার সুযোগ করে দিয়েছে সিরিয়াতে। তাছাড়া ইরান এবং সিরিয়াও খুব আগ্রহী ডলার ছাড়াও অন্য মুদ্রায় তাদের তেল বিনিময় করার জন্য। হোসনী মোবারক একটু বেশিই বিশ্ব রাজনীতি বুঝবার চেষ্টায় ছিল। শুরু হল আরব বসন্ত। কোথায়ও কিছু হল না। মাঝখান থেকে গাদ্দাফীকে জীবন দিতে হল, তিউনিসিয়া আর মিশরে শাসক পরিবর্তিত হল। এগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্যই বোধহয় "কাকতালীয়" শব্দটি সংযোজিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। তবে এবার ইতিহাসের পাতায় একটু প্যাঁচ খেয়ে গেল সিরিয়াতে এসে। পশ্চীমা বিশ্বের পরিকল্পনা এবং বিজয় কেতন উড়াবার ইতিহাস বহুদিন পর থমকে গেল সিরিয়াতে এসে।

সিরিয়ার ওইতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সিরিয়াতে এসে ইতিহাসকে আমরা আরও ঝঞ্চা বিক্ষুব্ধ অবস্থায় পাবো। অষ্টম শতকে এসে আব্বাসীয় খলিফারা দামেষ্ক থেকে তাদের রাজধানী বাগদাদে নিয়ে যাবার পর থেকেই আসলে এই এলাকাটি হয়ে ওঠে জাতিগত যুদ্ধের এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শক্তি পরীক্ষার যুদ্ধক্ষেত্র। বহু হাত বদল হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বৃটেন-ফ্রান্সের একটি গোপন চুক্তির বাস্তবায়বের পরিপ্রেক্ষিতে মূল সিরিয়া কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ফ্রান্সের ভাগে পরে বর্তমান

সিরিয়ার মূল অংশ ও লেবানন এবং বৃটিশ ভাগে পরে প্যালেস্টাইন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সিরিয়াতে স্বালানী তেলের আবিষ্কার বৃটেনকে সিরিয়ার প্রতি উৎসাহি করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৮ সালে ফ্রান্স এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়, বৃটিশরা এখানে অবস্থান নেয়। বৃটিশরা ১৯৫৮ সালে সিরিয়া-মিশরকে নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করার মাধ্যমে স্বাধীনতা দিলেও ১৯৬১ সালে সিরিয়া আলাদা রাষ্ট্র গঠন করে।

আমার ধারনা, সিরিয়া আক্রমনের পেছনে আরও কারণ রয়েছে। প্রধান কারণ নিহিত রয়েছে আফগানিস্তানে। আলকায়েদা যদিও পশ্চীমা বিশ্বের তৈরী কিন্তু তার হাত-পা এতো বেশী লম্বা হয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পরেছিল যে, আফগানিস্তান দখল করার পরও আল-কায়েদাকে দখল করা গেল না। শুরু হল নতুন পরিকল্পনা। এক ঢিলে দুই পাখি স্বীকারের খেলা। হঠাৎ ভেঙ্গে গেল আল-কায়েদা, তৈরী হল "আইএস" বা "ইসলামি স্টেট" নামের এক সংগঠন। এবং তৈরী হবার প্রায় সাথে সাথেই ঝড়ের গতিতে ইরাকের উত্তরাংশ সহ সিরিয়ার বৃহদাংশ দখল করে খিলাফত দাবী করে বসলো। খিলাফত?? এটা তো পরিকল্পনায় থাকার কথা নয়, এই শব্দটায় এলার্জি আছে পশ্চীমাদের। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপাতত চলুক, আগে "বাশার" আর রাশিয়াকে বিদায় করার জন্য "আইএস" কে শক্তি যোগান দেয়া যাক।

সমস্যা আরও তৈরী হল। আরব বিশ্বের নিজস্ব প্রক্সি যুদ্ধের ঘাঁটি হয়ে উঠলো সিরিয়া। বাশারকে সমর্থন দিল ইরান আর বাশার বিরোধীদের সমর্থন দিল সৌদি আরব। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হল এই খেলায়, বাস্তুহারা হল আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ। পশ্চীমা বিশ্বের মূল লক্ষ মানবতাকে রক্ষা করার কোন উদ্যোগই নেয়া হল না। এমনকি বাস্তুহারা মানুষ গুলোকে ঠাঁই দেবারও কোন প্রয়োজন বোধ করলো না তারা, "আইএস" এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো দূরের কথা।

পশ্চীমা বিশ্বের ধারনা ছিল, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মূলা ঝুলিয়ে সিরিয়া সংঘাতে তুরস্কের সমর্থন আদায় করতে পারবে তারা। হল না। কুর্দিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্মের কারণেই হোক অথবা রাশিয়ার সাথে বিরোধে না

জড়াবার ইচ্ছা থেকেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, তারা নিরপেক্ষ রইলো। আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল ২০১৪ সালে। ইউক্রেনকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা জানাবার সাথে সাথেই ক্রিমিয়ায় গনভোট আয়োজন করে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নিল। ইউক্রেইন রাশিয়াকে ছেড়ে যোগ দিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে। ঘরের পাশে শত্রু পক্ষের অবস্থান দেখে শংকিত রাশিয়া তার মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র ঘাঁটি সিরিয়াতে এবার দৃঢ় অবস্থান নিল। শুরু হল সিরিয়াতে আরেক প্রক্সি যুদ্ধ, রাশিয়া বনাম যুক্তরাষ্ট্র। এবার রাশিয়া কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে। প্রথমত, সিরিয়াতে তার ঘাঁটি আছে, দ্বিতীয়ত, পশ্চীমা বিশ্ব তো বলছেই তারা "আইএস" কে সরাতে চায়; রাশিয়ারও তো একই বক্তব্য। পশ্চীমা বিশ্বের অবস্থা দাঁড়ালো, না পারি কইতে-না পারি সইতে। যুদ্ধ বাশারের পক্ষে মোড় নিল। ইতিহাসের পাতায় এটিকে একটি নতুন অধ্যায় বলা যেতে পারে। এই প্রথম বোধহয় আরেকটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধের যুদ্ধে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ ভাবে পশ্চীমা বিশ্বের সাথে যোগ দিল না।

ইতিহাস পর্ব শেষ করবো ছোট্ট আরেকটি বিষয় চীন-রাশিয়ার ইতিহাস দিয়ে। এই বিষয় নিয়ে এখানে বেশী কিছু বলার নেই। একাদশ শতকের দিকে রাশিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর ভৌগোলিক ভাবে রাশিয়া-পারস্য-অটোমান সাম্রাজ্যের পাশাপাশি অবস্থানের কারনে বহুবারই তাদের মাঝে যুদ্ধ হয়েছে, শান্তি চুক্তিও হয়েছে। রাশিয়ার মূল ধর্ম কিন্তু অর্থোডক্স খ্রীষ্টান, যে ধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের ব্যাবধান কম। আর চীনের ইতিহাস? পশ্চীমা বিশ্ব, বিশেষ করে বৃটিশরা, যুদ্ধ সহ অনেক ভাবেই চীনের উপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সার্বিক ভাবে আধিপত্য বিস্তার কখনোই করতে পারে নাই। রাশিয়া-চীনের বিশাল সীমান্ত থাকা সত্বেও চৈনিক সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ কম হবার মূল কারণ বোধহয় প্রাকৃতিক। উড়াল পর্বতমালার আড়ালে দুর্গম সাইবেরিয়ার সাথেই চীন-রাশিয়ার বেশির ভাগ সীমান্ত।

ইতিহাসের নিয়ে এতো ঘাঁটাঘাটির কারণ আর কিছুই না, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্তমান আক্রমনাত্মক কথা বার্তাকে আমি চিহ্নিত করতে চাইছি পেট্রো-ডলারের প্রভাব ও বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা ধরে রাখার শেষ

হুংকার হিসেবে। তবে এটাকে আমি অন্তত মরণ কামড় বলবো না। বিশ্ব নেতারা দেয়ালের লিখন পড়তে পারেন ভালই, সুতরাং, তারা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থায় নিজের প্রতিপত্তিটুকু নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন মাত্র। বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এখন অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ ক'রে সাফল্য অর্জন করার সম্ভবনাকে শুন্য ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক যুদ্ধকে প্রাধান্য দিচ্ছেন হাজার গুণ বেশী। অতএব, আগের দেয়া অপশন্স গুলোর মাঝে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা পারমানবিক যুদ্ধের সম্ভবনা নাই বললেই চলে। তবে পারমানবিক অস্ত্রধর দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্র, পাক-ভারতের নেতৃবৃন্দের মনোভাব অবশ্যই আনপ্রেডিক্টেবল।

আর কথা না বাড়িয়ে এবার বোধহয় আধুনিক ইতিহাসের দিকে একটু সময় দিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে চলে যাওয়া সম্ভব।

আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কয়েকটি ঘটনা

১) চীনের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উত্থান

চীনের অর্থনৈতিক উত্থান বর্তমান বিশ্বের সকলের কাছেই বিস্ময়কর। ঐতিহাসিক ভাবে দেশটি মানব সভ্যতায় কাগজ, বারুদ সহ বহু অবদান রাখলেও মোঙ্গল ও আশেপাশের আরো কিছু লুটেরা ধরনের বাহিনীর আক্রমনে তটস্থ চৈনিক সম্রাটেরা ঔনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেয়ে নিজের সাম্রাজ্য সামলাতেই ব্যস্ত ছিল। এছাড়া বিপুল জনসংখ্যা ও খনিজ পদার্থের স্বল্পতা সবসময়ই চীনের অর্থনীতিকে চাপের মাঝে রাখতো। তারপরও চীন বহু আগে থেকেই পৃথিবীর প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বৃটিশদের সাথে ওপিয়াম যুদ্ধ সমুহের পর উনবিংশ শতক থেকে তারা ধীরে ধীরে এই অর্থনৈতিক অবস্থান হারাতে থাকে এবং বিংশ শতকের শুরু থেকে দুইটি চীন-জাপান যুদ্ধ তাদেরকে দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয়।

এরই মাঝে কমিউনিস্ট বিপ্লবে মাও ক্ষমতা গ্রহন করার পর অতিবিপ্লবী ধ্যান ধারনার বশবর্তি হয়ে, চীন এমন কিছু ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, দুর্ভিক্ষ থেকে শুরু করে সকল ধরনের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মাঝে চীন পতিত

হয়েছিল। মাওয়ের মৃত্যুর পর চলেছিল কিছুদিন রাজনৈতিক টানাপোড়েন। এরই মাঝে দেং জিয়াও পিং ক্ষমতা গ্রহন ক'রে, অতীতের সকল ভুল শোধরাবার চেষ্টায় সর্ব শক্তি নিয়োগ করার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলেন। তার মাঝে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হয়েও স্পেশাল ইকনোমিক জোন সৃষ্টি অন্যতম।

চীনের এরপরের সবটুকুই ইতিহাস। জিং জেমিনের আমলে ৯৭ সালে হংকং কে বৃটিশদের কাছ থেকে ফেরত পেয়ে কপাল খুলে গেল চীনের। ৯২ সাল থেকে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা শুরু হল তারই ধারাবাহিকতায় হু জিনতাও চীনের একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড তৈরী করে দিয়েছিলেন। আর শী' ক্ষমতায় এসে বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের অবস্থান নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেবার ফলে বিশ্বের পরাশক্তি সমুহের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। অথচ চীনের নিজস্ব কাঁচামালের সরবরাহ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। যে কারনে চীনকে বিশ্বের রিসাইক্লিং সম্রাট বলা যেতে পারে।

২) চীন-রাশিয়ার ঐক্য

আধুনিক বিশ্বের একটি যুগান্তকারী ঘটনা যদি উল্লেখ করতে হয় তবে আমি বলবো, চীন-রাশিয়া ঐক্য। আগেই বলেছি, এই দুইটি সাম্রাজ্যের মাঝে বিরাট সীমান্ত থাকলেও কখনই তারা নিজেদের মধ্যে বড় ধরনের কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পরেনি। তবে দুই সাম্রাজ্যের মাঝে আস্থার অভাব যে ছিল সেটা বোঝা যায়, কারণ, উনবিংশ শতকের শেষের দিকে শুরু হওয়া সাইবেরিয়া-মাঞ্চুরিয়া-পোর্ট আর্থার রেল রোড নির্মান ছাড়া আর কোন দৃশ্যমান সহযোগীতা বিংশ শতক পর্যন্ত ছিল না।

একবিংশ শতকের শুরুতেই সাইবেরিয়া থেকে চীনের পুর্ব ও পশ্চীমাংশ পর্যন্ত (পূর্বদিকে কোরীয়া পর্যন্ত) তেল-গ্যাস পাইপ লাইন চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করে। এখান থেকেই মূলত আগ্রাসী পেট্রো-ডলারের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক বিরোধের সূত্রপাত বলা চলে। যুক্তরাষ্ট্রের অতিমাত্রায় সামরিক হুমকী ও রাশিয়ার প্রতি সুপ্ত যুদ্ধমনোভাবাপন্ন আচরন ও অর্থনৈতিক

অবরোধ, চীন-রাশিয়ার এই সহযোগীতাকে উৎসাহিত করেছে বলে ধারনা করা হয়। চীন-রাশিয়ার এই যুথবদ্ধ অবস্থান পশ্চীমা বিশ্বকে দ্বিধাগ্বীত ও বিভক্ত করেছে মূলত জ্বালানীর কারনেই।

৩) ডলারের উপর নির্ভরশীল নয় এরকম একটি সমন্বীত জ্বালানী সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় চীন-রাশিয়া-ইরান সহ ইউরোপ ও ব্রিক্স এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরও কিছু দেশ যোগ দেবে বলে ধরেই নেয়া যায়। ইউরোপের বহু দেশের সমর্থন থাকবে বলার কারণ আর কিছুই নয়, ইউরোপের বিপুল গ্যাসের চাহিদা মেটাতে রাশিয়া এতদিন একচ্ছত্র ভূমিকা রেখে আসছিল। বর্তমানে কাস্পিয়ান সাগরের গ্যাস নেবার মত বিকল্প বন্দোবস্ত করতে হলেও ইউরোপের রাশিয়া ও ইরানের সহযোগীতা প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম বোধহয় পশ্চীমা বিশ্বের ঐক্যে ফাটল দেখা দিতে যাচ্ছে। যদিও ব্রেক্সিটের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যকে ইউরোপ থেকে আলাদা করার চেষ্টার মাধ্যমে ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রভাববলয় ধরে রাখার প্রচেষ্টাকে কিছুটা সামাল দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিন্তু নানান রকম নিজস্ব জটিলতায় যুক্তরাজ্য এখনো ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শেষ করতে পারছে না।

৪) ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চীন ও সাউথ আফ্রিকার অর্থনৈতিক সহযোগীতার সংগঠন BRICS

আধুনিক বিশ্বের আরেক যুগান্তকারী ঘটনা ব্রিক্স নিয়ে আলোচনা করার আগে ভারত-চীন-জাপান সম্পর্ক নিয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। বিশ্বের বর্তমান প্রধান (বা একমাত্র বললেও ভুল বলা হবে না) অর্থনৈতিক-সামরিক শক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে অন্তত অর্থনৈতিক ভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যদি সমগ্র এশিয়া ও রাশিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞজনেরা জাপানকে এক্ষেত্রে মূল বাধা বলে মনে করেন, কারণ, জাপান বহুবারই চীনের উপর আক্রমন করেছে এবং আধিপত্য বিস্তার করেছে। উনবিংশ শতকে চীনের প্রতি জাপানের শুধু আক্রমনাত্মক বললে ভুল হবে, জাপানের নিষ্ঠুরতার কথা কখনোই চীন-জাপানের মাঝে

বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে মনে হয় না। এরসাথে বিংশ শতকের শুরুতে রাশিয়া-জাপান যুদ্ধে চীনের বর্তমান বন্ধু এবং ব্রিক্সের অন্যতম অংশীদার রাশিয়ার বিপর্যয়কর পরাজয়ের গ্লানি তো রয়েইছে।

যদিও চীন-জাপান ব্যবসায়ীক কর্মকান্ড দিনকে দিন শক্তিশালী ভাবে এগিয়ে চলছে, সেই হিসেবে অনেকেই আশা নিয়ে বসে আছেন যে, জাপান তার নিজ অর্থনৈতিক স্বার্থ বুঝে একসময় তুরস্কের মতই নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে, তবে আবারও বলি, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ব্রিক্সের দুই প্রধান পরিচালন শক্তি চীন-রাশিয়ার সাথে জাপানের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বা সুন্দর ভাষায় বললে, অবিশ্বাস।

এদিকে ভারতের সাথেও চীনের রয়েছে ঐতিহাসিক অবিশ্বাস। এর মূলে রয়েছে উনবিংশ শতকে চীনের বিরুদ্ধে বৃটেনের চাপিয়ে দেয়া ওপিয়াম যুদ্ধ সমুহে ততকালীন বৃটিশ বাহিনীতে ভারতীয়দের অংশগ্রহন। যদিও চীনের জানা আছে যে, বৃটিশ উপনিবেশ হিসেবে ভারত সেটা করতে বাধ্য ছিল। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে শুরু হওয়া চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ, ৬২ সালের যুদ্ধ, তিব্বত ইস্যুতে ভারতের অবস্থান এবং সর্বশেষ দোখলাম মালভূমি নিয়ে দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থান সহ নানাবিধ কারণ এই ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু এই অবিশ্বাসের কারণে, লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও ভারত এখনো চীনের উদ্যোগ 'বেল্ট এন্ড রোড" এ অংশ না নিয়ে বসে আছে। তবে ঐক্যবদ্ধ এশিয়ার অবস্থানে এক্ষেত্রে একটি আশার বানী আছে, চীনের বর্তমান বন্ধু রাশিয়ার সাথে ভারতের রয়েছে ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব।

তারপরও এই পাঁচ জাতির সম্মিলন ব্রিক্স, তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলেছে। ব্রিক্সের সুবিধা হল, তাদের দেশগুলোর সম্মিলিত জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৪১%। তাদের সম্মিলিত জিডিপি পিপিপি পৃথিবীর ৩২%। সম্মিলিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় পাঁচ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলার এবং সম্মিলিত গ্রোথ রেট প্রায় ৬%। বিশ্বের মুরুব্বীদের মাথা খারাপ করে দেয়ার জন্য এই তথ্য-উপাত্তটুকুই যথেষ্ঠ বলে আমার মনে হয়।

৫) চীনের উদ্দ্যোগে গঠিত ব্রিক্স ব্যাংকিং সিস্টেম New Development Bank (NDB)

সাংহাই কেন্দ্রীক নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক বা NDB যথা সময়ে গঠন করার উদ্দ্যোগ নিয়ে বিশ্ব মুরুব্বীদের আরেক মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে ব্রিক্স। ৫০ বিলিয়ন ডলার মূলধন নিয়ে শুরু হলেও এটা ১০০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে আগামী এক বছরের মধ্যেই। ব্রিক্সের সদস্য রাষ্ট্র গুলো তাদের দেশের ভৌত অবকাঠামো তৈরী করার জন্য বছরে ৩৪ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে। এই ব্যাংক প্রথমত তার সদস্য রাষ্ট্র গুলোকে বিশ্ব অর্থনৈতিক তারল্য সংকটের সময় পাশে থাকবে বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই "কন্টিজেন্ট রিজার্ভ এগ্রিমেন্ট" কে দেখা হচ্ছে আইএমেফ বা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থার বিকল্প হিসেবে এবং এই চুক্তির পর তাদের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয় তুরস্কের আংকারাতে। এবার বোধহয় সিরিয়াতে তুরস্কের নিরপেক্ষ ভূমিকার একটি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল। পশ্চিম মুখী ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে ব্রিক্স কি তুরস্কের জন্য কোন অর্থনৈতিক সুবাতাস বয়ে আনতে পারে? শুরু থেকেই তুরস্কের প্রতি ইউরোপের বিমাতা সুলভ আচরনের কারণে হয়তো বিকল্প গুলো খোলা রাখতে চাইছে তুরস্ক।

তবে মূল বিষয় অন্যখানে। এই NDB ব্যাংক মূলত বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠছে এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এতোদিন যে পশ্চীমা বিশ্বের সুইফট (SWIFT) কোডের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল তাকেই চ্যালেঞ্জ ক'রে নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যাবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে চীন এখনই তাদের Cross-border Inter-bank Payments System (CIPS) চালু করেছে।

যে কারণেই বোধহয় চীনের প্রেসিডেন্ট শী' কিছুদিন আগেই বড় গলায় বলেছেন, সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের ধারনা একটি বোকার মত বাক্য ছাড়া কিছুই না। তার এই বক্তব্য যে শুধু পশ্চীমা বিশ্বের উদ্দ্যেশ্যে বলা হয়েছে সেটা মনে হয় না। এর ইতিহাস উনবিংশ শতকে জাপানের খোলামেলা সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের আলোচনাকে খোঁচা মারার চেষ্টা থেকেও হ'য়ে থাকতে পারে। যদিও

তিনি একই সময়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতির বিপরীতে বলেছেন, চীন শুধু চীনের নয়, সারা বিশ্বের এবং বর্তমান বিশ্বে কোন দেশ যদি নিজেকে আইসোলেট করে পেছন দিকে রওনা হয়, তারপরও “এশিয়া” সেটা করবে না। এশিয়া? পৃথিবী থেকে এশিয়া? তারমানে কি, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বর্তমানে চলমান বানিজ্য যুদ্ধ নিয়ে চীন শংকিত? অবশ্যই শংকিত হওয়া উচিৎ। কারণ, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের যতটুকু ক্ষতি হবে, তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবার সম্ভবনা বেশী চীনের। আমরা এগিয়ে যেতে থাকি, দেখা যাক এশিয়া ঐক্য থেকে বিশ্ব ঐক্যে পৌঁছাবার কোন আশার আলো খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

৬) চীনের বেল্ট এন্ড রোড নির্মান

বর্তমান পৃথিবীর সবচাইতে উচ্চাকাঙ্খী ও ব্যায়বহুল পরিকল্পনার কথা যদি বলতে হয় তবে চীনের বেল্ট এন্ড রোডের কথা বলতেই হবে। এই লেখায় এতোক্ষন যা বলে এসেছি সেটা এই ধরনের একটি লেখার সীমিত পাঠকেরা জানেন ধরে নিয়েই লিখছি ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্য (রবি বাবুর মত “আজি হতে শত বর্ষ পরে” এর মত কোন এক আশায়।

চীন তার বেল্ট এন্ড রোডের মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে সড়ক-রেল ও সামুদ্রিক যোগাযোগ বলয় তৈরী ক'রে এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে নিয়ে একটি বিরাট অর্থনৈতিক বলয় তৈরী করতে চাইছে। এই মহাপরিকল্পনার সাফল্য নিয়ে চীন বেশ নিশ্চিত, কারণ, তারা এই মুহূর্তে পৃথিবীর মূল রফতানীকারক (তেল এবং অস্ত্র ছাড়া) দেশ। এর সাথে যদি সাইবেরিয়ার তেল-গ্যাসকে যুক্ত করা যায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশকে যদি তাদের অর্থনৈতিক বলয়ের এই ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত করানো যায়, তবে আমিও মনে করি, আমরা এক নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি।

যদিও যুক্তরাষ্ট্র পুরো বিষয়টি হৃদয়াঙ্গম ক'রে কানাডা, মেক্সিকো, বৃটেন সহ কিছু দেশকে নিয়ে আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটি নিজস্ব প্রভাব বলয় ধরে

রাখার জন্য, তারপরও আমি বলবো নতুন ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে তারাও মানসিক ভাবে প্রস্তুত। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সুবিধা, তারা এখনো বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি। তাদের বিশাল স্বর্ণ, গ্যাস ও তেলের মজুদ এবং ভোক্তা নির্ভর অর্থনীতির কারণে তারা বিশ্ব থেকে এখনো কয়েক কদমই এগিয়ে আছে।

পেট্রো ডলারের কাছে যাবার আগে আর একটি ছোট্ট বিষয়ে আলোচনা করা যাক। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি ব্যবহার ক'রে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খোঁজার ইতিহাস সেই ১৮৯৮ সালে স্পেনের সাথে যুদ্ধ দিয়ে সাফল্যের সাথে শুরু হলেও ভিয়েতনাম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এর মৃত্যু ঘটেছে বলে আমি মনে করি। বর্তমান সিরিয়ার প্রক্সি যুদ্ধেও তাদেরকে পরাজিত না বললেও পরাভূত বলা যায়। চীন-রাশিয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ব্রিক্সের সম্পুর্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমার ধারনা মতে সময় লাগবে আরও দুই/তিন বছর। তারমানে, খুব বেশী চিন্তা ভাবনার সময় নেই। এখন যুক্তরাষ্ট্রের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে বলে মনে হয় এবং তারা তিনটি পথে একই সাথে এগিয়ে চলেছে।

১) কারো পছন্দ হোক আর নাই হোক, ডোনাল্ড ট্রাম্পের "আমেরিকা ফার্স্ট" নীতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বর্তমান অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলেই আমার মনে হয়েছে।। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র এখন পরনির্ভরশীল অর্থনীতিতে বসবাস করছে। তাদের অর্থনীতিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'লে আমার ধারনা, এই পদক্ষেপের সাথে কিছু আভ্যন্তরিন পরিবর্তন নিয়ে আসবে যুক্তরাষ্ট্র, যেমন, তাদের নিজেদের গ্যাস-তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা সহ ভোক্তা অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে আনার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেয়া।

২) রাশিয়া-চীনকে চাপের মধ্যে রাখবে। সেটাও তারা করছে। রাশিয়ার ওপর তারা চুড়ান্ত অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে এবং চীনের সাথে বানিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছে। এর সাথে তাদের মিত্রের সংখ্যা বাড়াবার উদ্যোগ

নেয়া শুরু করবে। অতি সাম্প্রতিক কালে তাদের গৃহিত কিছু পদক্ষেপের কারনে বন্ধু হিসেবে তারা বিশ্বাস যোগ্যতা হারাচ্ছে।

৩) তাদের অতি পুরাতন বহুল ব্যবহৃত অস্ত্র, "যুদ্ধ"। এই পরিকল্পনাতেও তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রথমে দক্ষিণ কোরীয়াকে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু ইউক্রেনে হস্তক্ষেপের পর রাশিয়ার আচরণে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা হলেও চিন্তিত এবং যে কারনে চীনের পাশে এরকম একটা যুদ্ধে চীনের ভূমিকা কি হতে পারে সেই বিষয়টি তারা গত শতাব্দির ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং কোরীয়ান যুদ্ধেই আঁচ করতে পেরেছে।

বাকি রইলো, তুরষ্ক ও ইরান। তুরষ্কের সাথে যুদ্ধ ন্যাটোতে ভাঙ্গন ধরানো ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্যে তাদের মিত্রদের মাঝেও ভাঙ্গন ধরাতে পারে, সুতরাং, সেই বিকল্পকে গ্রহণ না করার সম্ভাবনা বেশী। বাকি রইলো ইরান। ভীষন ঝুকিপুর্ণ ও বিপজ্জনক বিকল্প এটা। ইরাকের মাধ্যমে ইরানের সাথে যুদ্ধ আর নিজে সরাসরি যুদ্ধ করা এক কথা নয়। জাতিসঙ্ঘ এবং ন্যাটোকে একসাথে নিয়ে এই যুদ্ধে নামতে হলে ইরানের ভুল পদক্ষেপের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ইরান মনে হয়না ভুল করবে; বর্তমানে ইরানের পদক্ষেপ গুলো, যেমন, জাতিসঙ্ঘ ও ইউরোপের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা থেকে এই ধারনা করা যায়। তাছাড়া চীনের বেল্ট এন্ড রোড এবং ব্রিক্স অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইরানের ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা যেমন ইরান বোঝে তেমন চীন-রাশিয়াও বোঝে, তারাও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে ইরানের পদক্ষেপ সমুহে। সুতরাং, চুড়ান্ত অঘটন কিছু না ঘটলে, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলার জন্য ইরান কোন বিকল্প হ'তে পারে না।

পেট্রো-ডলার

পেট্রো-ডলার নিয়ে কথা বলতে হলে প্রথমেই যে দু'টি বিষয় সামনে চলে আসবে,

১) পেট্রো-ডলার কি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য ভাল না মন্দ।
২) বিশ্ব অর্থনীতিতে পেট্রো-ডলারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু।

আবারও বলি, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তি মারাত্মক ভূমিকা রাখা শুরু করেছে বিংশ শতকের শুরু থেকেই। সৌদি আরব বা মধ্যপ্রাচ্যের বেশীরভাগ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পেট্রো-ডলারের চুক্তি করেওছে যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক পরাক্রমের কারণেই এবং তাদের নিজ দেশের বা তাদের নিজ রাজত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষে।

সত্যি কথা বলতে ১৯৭৪ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পেট্রো ডলার যুক্ত করার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ছাড়াই মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সম্পুর্ন তেলক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পেট্রো-ডলারের বিরোধিতাকারীদের সামরিক ভাবে অথবা অর্থনৈতিক অবরোধের মাধ্যমে পর্যুদস্ত করেছে। তারপরও, একটি কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পেট্রো-ডলার বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্ত হবার বছর তিনেক আগে বিশ্বের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্ণ কেন্দ্রীক অঙ্গিকার থেকে সরে আসায়, বিশ্ব মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় যে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল, পেট্রো-ডলার চুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থপনায় আবার শৃঙ্খলা ফিরে এসেছিল।

তবে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়বারের মত পেয়ে গিয়েছিল অবাধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তাদের অর্থনীতিতে যথেচ্ছ ডলার ছাপানোতে কোন অসুবিধাই রইলো না। কাগুজে নোটের বদলে যখন ডিজিটাল লেনদেন শুরু হল, তখন তো আরও পোয়াবারো, ডলার ছাপানোর খরচও আর রইলো না। তার সাথে যুক্ত হল বিভিন্ন তেল রফতানীকারক দেশের বিশাল পেট্রোডলার রিজার্ভ। এই দেশ গুলো এতো অতিরিক্ত ডলার দিয়ে কি করবে। ডাক পড়লো ডলারের দেশ যুক্তরাষ্ট্রেরই। ঐসব তেল রফতানিকারক দেশের ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের ঠিকাদার কিংবা অস্ত্র ভান্ডার গড়াতেও একছত্র অধিপতি যুক্তরাষ্ট্র। তবে ঠিকাদারী ও অস্ত্র বিক্রি ছাড়া টেকনোলজি রফতানী কিন্তু সেই পরিমানে হয়নি।

ভৌত অবকাঠামো একটী দেশ কত বাড়াতে পারে। অস্ত্রই বা আর কত লাগতে পারে। একসময় দেখা গেল তেল রফতানীকারক দেশগুলোর হাতে পেট্রো ডলার বেড়ে যাচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঠিকাদারি কমে আসছে, যুক্তরাষ্ট্রের

অর্থনীতিতে চাপ বাড়ছে। কি করা যায়?? আগেই বলেছি, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উদ্ভাবনী শক্তিকে খাটো করে দেখবার কোন কারণ নেই। তারা শুধু তেল রফতানিকারক দেশ গুলো নয় অন্যান্য পন্য রফতানীকারক দেশ, যেমন, চীন, জাপানের কাছেও ট্রেজারী বণ্ড নামের আরেকটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে, স্বল্প সুদে ঋন হিসেবে ঐদেশ সমুহের ডিজিটাল ডলার গুলোকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ নিল। এই মুহূর্তে চীন প্রায় ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের ট্রেজারী বণ্ড কিনে যুক্তরাষ্ট্রকে ঋন দিয়ে রেখেছে এবং সব দেশ মিলিয়ে ট্রেজারী বণ্ডের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমান বিশ ট্রিলিয়নের ডলারের উপরেই হবে। এতো ঋন শোধবার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের আছে কিনা সেটা বোঝার জন্য খুব কষ্ট করতে হবে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে চীনের সাথে যে বানিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছে, সেই যুদ্ধে চীনকে বেশী চেপে ধরলে, চীন যদি শুধু তার ট্রেজারী বণ্ড ফেরত পাঠিয়ে বসে, তবে ১৯৩০ সালের মত আরেকটি গ্রেট ডিপ্রেশন যুক্তরাষ্ট্রে তৈরী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

এই পেট্রো ডলারের সাথে বোঝার উপর শাকের আঁটি হিসেবে যুক্ত হয়েছে ব্রিক্স দেশ সমুহের স্বর্ণ কেনার প্রবনতা। এই প্রবনতা প্রমান করে যে, তারা আর ডলারের উপর আস্থা রাখতে পারছে না অথবা তারা বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত।

অর্থাৎ, “ব্রেটন উড” চুক্তির মতই “পেট্রো ডলার” চুক্তিতেও যুক্তরাষ্ট্র অনেক বেশী ভাত দুধ দিয়ে মাখিয়ে ফেলেছে। এখন না পারছে তারা সেই ভাত খেতে, না পারছে ভাত গুলো ফেলে দিতে। “ব্রেটন উড” চুক্তির মত যদি যুক্তরাষ্ট্র এখন তাদের ট্রেজারী বণ্ডকেও অস্বীকার করে, তবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পরবে। অতএব, এটা বলা ভুল হবে না যে, "পেট্রো ডলার" কিছুদিন আগে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে অবাধ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিলেও বর্তমানে এটা তাদের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানেই চলে আসে দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিশ্ব অর্থনীতিতে এখন পেট্রো-ডলারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। আমার মতে, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠার আগে, এই মুহূর্তে হঠাৎ করে বিশ্ব অর্থনীতিকে পেট্রো-ডলার থেকে বের করে

আনার চেষ্টা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রও বুঝতে পারছে আরেকটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সময়ের ব্যাপার মাত্র এবং সেই ব্যবস্থাকে তারা খুশী মনে স্বাগত না জানাতে পারলেও বাঁধা না দিয়ে গলার কাঁটাটি সরাবার চেষ্টাই করছে বলেই মনে হয়। তবে সেই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগের অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকুকুই বর্তমানের হুমকী ধামকীর মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী অবস্থানে রেখে আলোচনার টেবিলে বসবার ভাবনা।

উপসংহার

এতো কিছুর মাঝে আমাদের মত দেশগুলোর, বিশেষ করে বাংলাদেশের কি লাভ হতে পারে? আশা অনেক কিন্তু বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাও অনেক। তবে আমরা এশিয়ার দেশ হিসেবে ভবিষ্যতে চীনের দিকে কিছুটা হলেও ঝুঁকে পরতে বাধ্য এবং রাশিয়ার সাথে আমাদের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, সুতরাং, অতি সাবধানী পদক্ষেপ অপ্রয়োজনীয়। বিশেষত যেহেতু ভারত ব্রিক্সের পূর্নাঙ্গ সদস্য, সুতরাং, চীনের প্রতি ভারতের যতই অবিশ্বাস থাকুক না কেন, তাদেরও এক সময় ঐদিকেই ঝুঁকে পরতে হবে।

আগামী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ইউরো, উয়ান এবং রুবলের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবার কোন কারণ নেই। অথচ পৃথিবীতে এখনও অতিরিক্ত প্রায় আট ট্রলিয়ন পেট্রো-ডলার অলস ভাবে পরে রয়েছে এবং তার সাথে যুক্ত হবে যুক্তরাষ্ট্রের ২০ ট্রিলিয়ন ডলারের উপর ট্রেজারী বণ্ড নামের ঋণ। এই ডলার গুলো কয়েক বছর পরে শুধু কাগজে কলমে শোভা পাবার আগেই বিশ্বের অর্থনীতিতে কি ভাবে নিয়ে আসা যায় সেটা নিয়ে ভাববার এখনই সময়। কি ভাবে?? যে দেশের "মনরো'জ ডক্ট্রিন, ব্রেটন উড এগ্রিমেন্ট, মার্শাল প্ল্যান, পেট্রো-ডলার" চুক্তির মত অর্থনৈতিক উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস রয়েছে, তাদের জ্ঞান দেবার কিছু নেই। তবে জুজুর ভয় দেখিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে মাত্র ৮০০ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করে এই সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, আগামীর পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে যাবে এবং ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা তৈরী হবেই। সেই ঐক্যের বন্ধনে কাদের ভূমিকা কতটুকু শক্তিশালী হবে সেটা নির্ধারনের সময় এখনই।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন যদি কার্যকর করা সম্ভব হয় তবে বিশ্ব ইউনিয়ন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা অসম্ভব হবে কেন? কারো ইন্ধনে যদি কোন দেশ যদি বিশ্ব ইউনিয়ন ব্যবস্থায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে বৃটেনের মত ভূমিকা নেয়, সেটা তখন দেখা যাবে। আমার মতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন পথিকৃত হিসেবে কাজ করতে পারে বিশ্ব ইউনিয়ন ব্যবস্থার এবং তাদের মতই একই ধরনের বিশ্ব পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে সবই সম্ভব শুধু নয়, আমি এরেকটু আগ বাড়িয়ে বলবো, অবশ্যম্ভাবী।

আর হান্টিংটন সাহেবদের মত পশ্চীমা সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের স্বপ্নচারীরা যখন একটি ধর্মের সাথে পশ্চীমা সভ্যতার যুদ্ধের স্বপ্নই শুধু দেখেন না, "দি" শব্দটা লাগিয়ে সেই বিষয়ে নিজেদের ভাবনা কে প্রত্যয়িত করে নিশ্চিত করেন, তখন তাদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথাই বলতে ইচ্ছা হয়,

১) একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে হাজার বছরের পথ পরিক্রমায়। বর্তমান পশ্চীমা সভ্যতার ব্যাখ্যাটা হান্টিংটন সাহেবেরা যদি দয়া করে আমাকে খুঁজে দিত তবে আমার নিজের প্রচন্ড উপকার হ'ত, কারণ, পশ্চিমা সভ্যতা বললেই আমার চোখের সামনে একটি দৃশ্যই ভেসে ওঠে, কানে হেডফোন, একহাতে মোবাইলে গেমস খেলছে, আরেক হাতে রয়েছে বার্গার আর জামার পকেটে রাখা কোন এক কোলার বোতলে স্ট্র লাগিয়ে খেতে খেতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে চলেছে অনিশ্চয়তার দিকে।
২) হান্টিংটন সাহেবদের আমি প্রত্যয়ন যুক্ত নিশ্চয়তা প্রদান করছি, বর্তমান বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটাতে "ইসলাম" ধর্মের সাথে পশ্চীমের সংঘাত হবার কোন সম্ভবনা নেই, কারণ, ইসলামী বিশ্বের বেশীরভাগ দেশই হান্টিংটন সাহেদের ভাবনাকে বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, এখন পর্যন্ত পশ্চীমা বিশ্বের পক্ষেই আছে। আর সে কারণেই, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি শেষ পর্যন্ত কোন করণে সংঘটিত হয়ই তবে সেটা অতীতের মতই পশ্চীমের সাথে পশ্চিমেরই হবে, অর্থাৎ, দুই পক্ষের পার্থক্য শুধু "ঈ" এবং "ই" এর মতই সামান্য কিছু দিয়ে নির্ণয় করা যাবে।

(সমাপ্ত)